আমাদের সঙ্ঘ

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী খুব সহজ ভাষায় গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ পরমপূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের একটি দর্শনের কথা প্রায়ই বলতেন। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই দর্শন খুব গুরুত্বপূর্ণ। মা দর্শন করেছিলেন, লালশাড়ি পরা একটি অল্পবয়সি মেয়ে ঝাঁটা-হাতে আবর্জনা সরিয়ে দিচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল, সে সব ধুলো-ময়লা সরিয়ে দিয়ে, হাতের কলস থেকে চারদিকে অমৃত ছড়িয়ে দিয়ে যাবে। অর্থাৎ সব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়ে শুভদিন আসবে, দেবী তাঁর কুম্ভটি থেকে অমৃতবারি সিঞ্চন করে সকল প্রাণীকে শান্তি দেবেন, ধরিত্রীকে শীতল করবেন। পূজনীয় মহারাজ বলতেন, ওই মেয়েটি দেবী শীতলা, যিনি আসলে স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়েরই একটি রূপ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠে মন্দির উদ্বোধনের সময় এই ঘটনাটির উল্লেখ করে পূজনীয় মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, সঙ্ঘের প্রতি সদস্যই মায়ের ওই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ। মা সহস্রভুজা হয়ে সঙ্ঘের মাধ্যমেই তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করবেন।

আমরা শ্রীশ্রীমায়ের আর একটি দর্শনের কথা স্মরণ করতে পারি যা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। ১৮৯৩ সালে মা কিছুদিন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে ছিলেন। সেইসময় এক রাতে তিনি গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন। চারিদিক চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। হঠাৎ দর্শন করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পিছন থেকে এসে গঙ্গায় নেমে গঙ্গাতেই মিশে গেলেন; কিছুক্ষণ পর স্বামীজী এসে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলতে বলতে দুহাতে সেই ব্রহ্মবারি নিয়ে চারিদিকে সমাগত অগণিত নরনারীর শিরে সিঞ্চন করতে লাগলেন। মা দেখলেন, পবিত্র বারিস্পর্শে সেই জনসঙ্ঘ সদ্যোমুক্তি লাভ করছে। এই দর্শন মায়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের রহস্য উন্মোচিত করেছিল এবং তাঁর চিত্তে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই দর্শনের তাৎপর্য আমরা মনন করতে চেষ্টা করব।

প্রথমত, গঙ্গায় শ্রীরামকৃষ্ণের মিশে যাওয়া ব্যাপারটি ভাবলে মনে হয়, স্বামীজী বারবার বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘশরীরে মিশে আছেন—সঙ্ঘের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে তিনি উপস্থিত। সুতরাং সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ত্যাগী-গৃহী সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আধ্যাত্মিকতা ও শক্তির সুবৃহৎ রামকৃষ্ণ-জলাধারের এক-একটি বুদবুদ। এই

বিশাল জলাধারের সঙ্গে যদি সচেতনভাবে যুক্ত হতে পারি, তাহলে আমরা ধন্য হব।

দ্বিতীয়ত অসংখ্য মানুষের ওপর স্বামীজীর গঙ্গাবারি সিঞ্চনের অর্থ, সঙ্ঘের সামনে সমগ্র বিশ্বের মানুষের উদ্ধারের মহৎ দায় অপেক্ষা করছে। সঙ্ঘের মাধ্যমেই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ প্রচার করছেন এবং অগণিত মানুষের প্রাণে শান্তি দিচ্ছেন।

তৃতীয়ত স্বামীজী ভগবান বুদ্ধের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আর একটি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন—১ মে ১৮৯৭-এর সেই ঐতিহাসিক দিনে, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাকে বলা যেতে পারে ব্যাবহারিক বেদান্তরূপ ধর্মচক্র। অন্যান্য সঙ্ঘের তুলনায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ অপেক্ষাকৃত নবীন। কিন্তু এটি হাজার হাজার বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে আছে। ভারতের সনাতন ধর্ম ছাড়াও তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রদর্শিত পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সর্বজনীন ভাব।

বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুসাধক জগতকে মায়া বলে ঘৃণা করেছেন, জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুক্তিলাভের জন্য সাধনা করেছেন। তাঁদের মতে এই জগৎ মোহ ও দুঃখের আগার। স্বামীজীই ওই 'বনের বেদান্ত'কে জনসাধারণের কাছে নিয়ে এলেন। ত্যাগ ও সেবার প্রাচীন আদর্শগুলির চমৎকার যুগোপযোগী ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি ইতিবাচক চিন্তাধারা এবং আশাবাদের নতুন যুগ এনে দিলেন আমাদের সামনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ : এক মহান সর্বজনীন ঐকতান

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বারো বছরের সাধনজীবনের শেষে উপলব্ধি করেছিলেন, ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের নির্গুণ-সগুণ, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলি এক পরম সত্যেরই প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ সব ধর্মের, জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সব যোগের এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় করেছেন। 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক অসাধারণ প্রবন্ধে স্বামীজী বলেছেন, এই বিবদমান সম্প্রদায়গুলির মূলগত চিরন্তন ঐক্য ও সত্যকে প্রমাণ করতেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণের এই সার্বিক সমন্বয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এক সর্বজনীন ঐকতান।'' এই সমন্বয় অত্যন্ত সুচারুরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে স্বয়ং স্বামীজীর অঙ্কিত সঙ্ঘের মনোগ্রাম বা প্রতীকের মাধ্যমে। স্বামীজীর ভাষায় : ''চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস-প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়, চিত্রের ইহাই অর্থ।''

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজী উভয়েই দেখিয়েছেন যে হিন্দুধর্মের তিনটি প্রধান দার্শনিক শাখা দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত হল পরম সত্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সোপানশ্রেণির বিভিন্ন ধাপ।

প্রসঙ্গত মাদ্রাজে ১৮৯৭ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। জনৈক পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করতে এসে বললেন, ''যদি আপনি যা দাবি করেন তা সত্য হয়, তাহলে আচার্য শংকর একথা কোথাও বলে যাননি কেন?'' স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, এই কাজটি তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

বহু মত ও পথ অবলম্বনে সাধনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি হয়েছিল, সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক। তিনি বলেছেন, ''যত মত তত পথ।'' বেদ ঘোষণা করেছেন ''একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি''—সত্য এক, জ্ঞানীরা তার নানারকম ব্যাখ্যা

করে থাকেন। এর জ্বলন্ত উদাহরণ তাঁর জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যাতে তিনি আর একটি নতুন সম্প্রদায় গঠন না করেন, কারণ ভারতে সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না। ঠাকুর-স্বামীজী এসেছিলেন সমন্বয় করতে, শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায় তিনি গড়তে এসেছিলেন, কোনওকিছু ভাঙতে আসেননি।

স্বামীজী তাঁর রচিত বিখ্যাত প্রণামমন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন সর্বধর্মস্বরূপ, অবতারবরিষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বপূর্ব সকল অবতার ও আচার্যের আধ্যাত্মিক শক্তির সমষ্টিভূত বিগ্রহ। হিন্দুধর্ম শুধু নয়, সকল ধর্মই এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর ভাবাদর্শ হল সকল ধর্মের সঙ্গে সমন্বয়। তাই আমাদের সঙ্ঘে সকল অবতার ও ধর্মাচার্যদের আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং পূজা করি। এই মহান সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সঙ্ঘের সদস্যরাও সবরকম ধর্মগত ও জাতিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী উপস্থিত সকলের মন এক মুহূর্তে উচ্চস্তরে তুলে দিয়েছিলেন 'তোমরা অমৃতের সন্তান' বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান হয়ে আমাদেরও প্রতি মুহূর্তে মনে রেখে চলতে হবে যে মানুষ অমৃতের সন্তান। সর্বপ্রথম মানুষকে তার প্রাপ্য যোগ্য সম্মান দিতে শিখতে হবে। পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী আমাদের বলতেন, ''তোমরা আত্মা, আমিও আত্মা। আত্মার যোগ্য মর্যাদা আত্মাকে দিতে হবে।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহারাজ সবসময় সকলকে যুক্তকরে আপ্যায়ন করতেন, বয়ঃকনিষ্ঠদেরও।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মাধ্যমে জগতে এই প্রথম কর্মযোগের পথকে—ত্যাগ ও সেবার পথকে মুক্তির রাজপথ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সকলের জন্যই এই রাজপথটি খুলে দিয়েছেন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। শিবজ্ঞানে জীবসেবা—ঠাকুরের শ্রীমুখের এই কথায় নতুন আলোক লাভ করে স্বামীজী এই নতুন কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। তিনি বলেছেন, ''তারাই যথার্থ বেঁচে থাকে যারা অন্যের জন্য বাঁচে।'' বলেছেন, ''দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।'' তাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ দরিদ্র ও আর্তদের পাশে সবসময় রয়েছে। স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের তাঁর ভাবাদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে দেখে ভগিনী নিবেদিতাকে গর্ব করে লিখেছিলেন, ''বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণসন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।''

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে স্বামীজী স্থির করেছিলেন, মঠ ও মিশন চলবে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের মঙ্গল—এই আদর্শে।

মাতৃ-আরাধনা : সঙ্ঘের আর এক অনুপম আদর্শ

ভগিনী নিবেদিতা খুব সুন্দর করে বলেছেন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তার যথাসর্বস্ব দিয়ে দিয়েছে নারী ও জনসমাজের উদ্ধারের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল নারীকেই জগন্মাতার জীবন্ত প্রকাশ রূপে দেখতেন। শ্রীমা সারদা দেবীকে ষোড়শীপূজার মাধ্যমে তিনি ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের নারীজাতির তথা মাতৃশক্তির সুপ্ত কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। নিবেদিতা বলেছেন, সংশয়ের এই যুগে মানুষকে পথ দেখাতে এবং তাকে দৃঢ় রাখতে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজী মাতৃ- আরাধনার উদ্বোধন করে গিয়েছেন।

স্বামীজী জগতে একমাত্র আচার্য যিনি নারীকে সন্ন্যাসের অধিকার দিয়েছেন। বেদান্তে তত্ত্বগত-ভাবে তা অনুমোদিত ছিল ঠিকই কিন্তু তার বাস্তবরূপ দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি যদি এই বিষয়টি সঙ্ঘের নিয়মাবলীতে অন্তর্ভুক্ত না করতেন, এত স্পষ্টভাবে নির্দেশ না দিতেন, তাহলে 'মাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠা' কোনওদিনই সম্ভব হত না। তাই

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের দ্বিতীয় সহাধ্যক্ষা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা দয়াপ্রাণামাতাজী (১৯১৩-২০০০) বলতেন, ''সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীদের সন্ন্যাসব্রত রক্ষার দায়িত্ব একান্তভাবেই স্বামীজীর। যখনই মেয়েদের সন্ন্যাস অনুষ্ঠান হয়, তখন স্বামীজীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হয়।''

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ : 'পিওরিটি ড্রিলিং মেশিন'

স্বামীজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি একটি 'পিওরিটি ড্রিলিং মেশিন' চালু করে দিয়ে গিয়েছেন। অতএব আমরা বলতে পারি সঙ্ঘ একটি যন্ত্র, যে-যন্ত্রে মানুষ তৈরি হয়। একবার সঙ্ঘে প্রবেশ করলে মানুষের অহংকার নাশ হয় এবং সব মালিন্য কেটে গিয়ে শুভ চরিত্র তৈরি হয়। তবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের নতমস্তকে খোলা-মনে সঙ্ঘ-যন্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করে নিতে হবে।

কিন্তু যদি কারও মনে সঙ্ঘের প্রতি বিরূপ ভাব জাগে তবে সে মনের দিক থেকে বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। জনৈক প্রাচীন সাধু মন্তব্য করেছিলেন, ''সঙ্ঘে যোগদান করার সময় আমরা ঠাকুরকে বলি—আমার সর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করব—তন, মন, ধন—অর্থাৎ আমাদের শরীর, মন, প্রতিভা সবকিছু। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের উপর। সঙ্ঘকে একটি আখের রস মাড়াই যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেই যন্ত্র থেকে রস ও ছিবড়ে দুটোই বের হয়। এখন আমি রস হব না ছিবড়ে হব, সেটা আমারই উপর নির্ভর করছে।''

এই যন্ত্রের ছোট-বড় অংশ আমরা। বলা বাহুল্য যন্ত্রাংশগুলির মধ্যে সংঘর্ষ থাকবেই। তবে এই 'মেশিন'-এর মধ্যে পড়ে আমাদের সকল মলিনতা বা কুটিলতা চলে যাবে। নদীর মধ্যে ঘুরতে থাকা পাথরের কথাই ধরা যাক। জলের স্রোতে পড়ে ঘুরতে ঘুরতেই এবড়ো-খেবড়ো কর্কশ পাথর এক সুন্দর মসৃণ পাথরে পরিবর্তিত হয়। তাই যেভাবে স্বামীজী বলেছেন ঠিক সেইভাবে সঙ্ঘজীবনে থাকতে পারলে আমরা মানুষ হবই। এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরই আমাদের ভবরোগের চিকিৎসক। তাঁর চিকিৎসায় সানন্দে সম্মত হয়ে থাকা চাই।

সঙ্ঘের সংহতি

এই সঙ্ঘরূপী যন্ত্রের সুচারু পরিচালনার জন্য চাই সদস্যদের পরস্পরের প্রতি প্রেম। স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে কত ভালবাসা ছিল! মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, তাঁদের পারস্পরিক ভালবাসা যেন ধরাছোঁয়া যেত—একজনকে চিমটি কাটলে আর একজন 'উহু' করে উঠতেন।

শ্রীশ্রীমা বলেছেন, সকলেই তাঁর সন্তান। এই ভাবটি যেন সঙ্ঘরূপ চাকায় তেলের মতো—যা চলার পথে সংঘর্ষ কমিয়ে দেয়। তাঁর গণ্ডিভাঙা আন্তরিক ভালবাসা সঙ্ঘের সকল সদস্যদের মনে প্রেম ও আনুগত্য জাগিয়ে সমস্ত সঙ্ঘকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে।

একইসঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়ের প্রতি ভালবাসাই সঙ্ঘের সংহতি বা ঐক্যকে ধরে রেখেছে। ভ্রাতৃপ্রেম এবং দিব্যত্রয়ীর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস বর্তমান যুগে অনুপম দৃষ্টান্ত। এককালে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে যে-মন্ত্রের অনুরণন ঘটেছিল—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'—তারই যেন এযুগে আবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

শিবাবতার স্বামীজীর মুখ দিয়ে কখনও কোনও অভিশাপবাক্য বের হয়নি। তবে সঙ্ঘের সংহতি যে ভঙ্গ করতে চাইবে, তার প্রতি সঙ্ঘের অভিশাপ নেমে আসবে—এই সতর্কবাণীটি তিনি কঠোর ভাষায় উচ্চারণ করে গেছেন।